প্রথম অধ্যায়

লোককথার ইতিবৃত্ত

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন যে, আমাদের পাঁচটি মহাদেশ কোন এক সময় গায়ে গায়ে মিশে ছিল। পরবর্তীকালে নানা আলোড়নের ফলে আস্তে আস্তে মহাদেশগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। তাঁদের মতে এখনো এই মহাদেশসমূহ ক্রম-অপসৃয়মান। তবু তাদের মধ্যে সাদৃশ্যের চিহ্ন থেকে গেছে। সমগ্র বিশ্বজুড়ে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে মানসিক ও মানবিক সেতু বন্ধনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লোককথা। তাই লোককথা প্রতিটি মানব জাতির নিজস্ব ভাষায় সৃষ্টি হলেও তার এক আন্তর্জাতিক অনুভব থাকে। আদি মানবের আর্থ সামাজিক মননের, লোক সমাজের সংগ্রামশীল রূঢ় বাস্তব-ঐতিহাসিক রূপের সন্ধান আমরা লোককথার মধ্যে পেতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হল— কবে থেকে মানুষ এইসব লোককথা বলছেন ? লোককথার উৎস সন্ধানে আমরা প্রাচীন সাহিত্যের প্রসঙ্গকে বাদ দিতে পারি না। বিশেষ করে ভারতবর্ষের লোককথার আলোচনা সূত্রে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের প্রসঙ্গকে আমরা বাদ দিতে পারি না। আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে লোককথার উৎস সন্ধানের প্রয়াস পেতে পারি।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীনতম মহাকাব্য—'রামায়ণ', যার পটভূমি বৈদিক যুগ। রামায়ণের রচনাকাল বিতর্কিত। আনুমানিক পাঁচশ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে রামায়ণ রচিত। মহর্ষি বাল্মীকির কৌতূহল নিরসনের জন্য 'চারণ কবি' ত্রিলোকদর্শী নারদ রামচন্দ্রের কথা শুনিয়েছেন। সুতরাং চারণকবি নারদ 'আদিকবি' বাল্মীকিকে যে জীবনকাহিনি শুনিয়েছেন, রামায়ণ রচিত হবার অনেক আগেই তা লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। অতএব আমরা বলতে পারি 'রামায়ণ'-এর কাহিনি ও উপাদান মৌলিক নয়। রামায়ণের মূল ভিত্তি লৌকিক কাহিনি। লোকসমাজের কাহিনি বাল্মীকির প্রতিভায় নবরূপ লাভ করেছে। রামায়ণের সমস্ত অবয়ব জুড়ে রয়েছে লোক-উপাখ্যান। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, রামায়ণের মধ্যে এমন অনেক কাহিনি আছে যা লোককথার আদলে বর্ণিত হয়েছে। 'সীতাকে শস্য ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, তিনি ধরিত্রীর সন্তান, পিতামাতা ছাড়াই তার জন্ম হয় ; এছাড়া রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন—এদের জন্ম বৃত্তান্তের মধ্যে লোককথার একটি অতি পরিচিত বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তরাকাণ্ডে কুকুরের অভিযোগ এবং গৃধ্র ও উল্লুকের কাহিনির মত এমন

অনেক কাহিনি আছে যাকে লোককথার উদাহরণ রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। রামায়ণের রাক্ষসদের উদ্ভব সংক্রান্ত কাহিনিতে, রাক্ষসরা ইচ্ছামতন রূপ বদল করতে পারে, রাক্ষসদের নিঃশ্বাসে মেঘের গর্জন, তাদের প্রাণভোমরা অন্যত্র সংরক্ষিত, রাক্ষসরা মানুষখেকো—ইত্যাদি কাহিনি বিষয়গুলির মধ্যে লোককথার উপাদান রক্ষিত আছে। আসলে লোকবিশ্বাসের রাক্ষসই রামায়ণে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। বাক্যবাদী পশুপাখি, পায়েস ভক্ষণে গর্ভসঞ্চার, যাদুমন্ত্র, রূপবদল করা প্রাণী, পূর্বজন্মবাদ—প্রভৃতি অলৌকিক ও আধিভৌতিক বিষয়গুলি লোককথার চরিত্রকে স্মরণ করায়। অগস্ত্যমুনির সমুদ্র পান, বাক্যবাদী পাখি জটায়ু, স্বয়ম্প্রভার সাহায্যে ঋক্ষবিল থেকে চোখ বন্ধ করে নিমেষে হনুমান বানরাদির উদ্ধার হওয়া, রামচন্দ্রের বলা-অতিবলা মন্ত্রলাভ — ইত্যাদি বিষয়গুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে প্রাচীন ভারতের লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, সামাজিক প্রথার বর্ণনা, এক কথায় আদিম বিশ্বাস সম্পর্কিত লোককথা। লোকসমাজের এইসব লোকগাথা নারদমুনির কাছে শুনে অনন্য কাব্যরূপ দিয়েছেন আদিকবি বাল্মীকি তাঁর রচিত রামায়ণ মহাকাব্যে।

নানা ধরনের গল্প, উপকথা, পুরাণকাহিনি, দার্শনিক তত্ত্বের বিশালায়তনের সাহিত্যকর্ম 'মহাভারত'। প্রাচীনপন্থী অনেক পণ্ডিতের মতে ৩০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে মহাভারত রচিত। ইউরোপীয় কোন কোন গবেষকের মতে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে মহাভারত রচিত। প্রখ্যাত সমালোচক ম্যাকডোনেলের মতে ভারতবর্ষে মহাকাব্যের আবির্ভাব খ্রিস্টপূর্ব ৫০০—৫০ বছরের মধ্যে। মহাভারতের রচনাকাল বিতর্কিত হলেও একথা স্বীকৃত যে সাহিত্যের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ কাব্য —'মহাভারত'। 'মহা' শব্দের অর্থ হল 'মহান' এবং 'ভারত' শব্দের অর্থ হলো 'ভরতের বংশধরগণ', যার থেকে এদেশের নাম —'ভারতবর্ষ'। সুতরাং 'মহাভারত' শব্দের অর্থ 'মহান ভারত' এবং 'ভরতের মহান বংশধরগণের কাহিনি'। মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক। এতবড় কাব্য কোন এক সময়ে, কোন এক ব্যক্তির রচনা কি-না সন্দেহের অবকাশ থাকে। নানা কবির, নানা সময়ের রচনা এর মধ্যে থাকলেও কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাসের নামেই সমগ্র মহাকাব্যটি প্রচারিত হয়েছিল বলে মনে হয়। তাছাড়া মহাভারতকে বলা হয়েছে 'সংহিতা'; 'সংহিতা' শব্দের অর্থ সংগ্রহ, একত্রীকরণ, একত্রীভূত। অর্থাৎ যে সব খণ্ড খণ্ড আখ্যান ও ঐতিহ্য সেইকালে প্রচলিত ছিল, সেগুলিই মহাভারতে সংকলিত হয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি লৌকিক উপাদানই মহাকাব্য মহাভারতের আদি উৎস। মহাভারতের মূল কাহিনি কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, পুণ্যের জয় এবং পাপের পরাজয়—এক মহান গাথার মধ্যে কাহিনির সমাপ্তি হলেও প্রবহমান অনেক উপকাহিনি এবং লোককথা যে এর মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আর্যরা ভারতে এসেছিল ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে। এই গোষ্ঠীগুলি ক্রমে ক্রমে বিস্তারলাভ

করে এবং একটি জাতিতে পরিণত হয়। অবশেষে তারা হয়ে ওঠে ভারত ভূখণ্ডের অবিসম্বাদিত শাসনকর্তা। তারপর একই পরিবারের দু'টি শাখার মধ্যে প্রভুত্বলাভের জন্য যুদ্ধ বাধে। এই হলো মহাভারতের যুদ্ধ। আমরা জানি মহাভারতের কেন্দ্রগত কাহিনি হলো জ্ঞাতি ভাইদের দ্বারা গঠিত দুইটি পরিবারের মধ্যে ভারত সাম্রাজ্যের অধিকার নিয়ে যুদ্ধ। আঠারোটি পর্বে বিভক্ত, প্রায় লক্ষাধিক শ্লোকে বর্ণিত এই গ্রন্থটি তৎকালীন সমাজের লোককথার ভাণ্ডার। এই গ্রন্থে আছে সমকালীন সমাজের রীতিনীতি, সংস্কৃতির শতশত উপকাহিনি, যেগুলি লোককথার চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। অলৌকিক জন্ম, অযোনিসম্ভব নরনারী, মন্ত্রপুত জলপানে পুরুষের গর্ভসঞ্চার, যাদুবিদ্যার প্রভাব, অসম্ভব ক্ষমতাসম্পন্ন মনুষ্যেতর জীব, সমুদ্রপান, সমুদ্রমন্থন—ইত্যাদি আধিভৌতিক বিষয়গুলি লোককথার বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করায়। মৃত্যুর দেবতা প্রেমের শক্তির কাছে অসহায়—সাবিত্রীর উপাখ্যান, ভারতবর্ষের প্রতিটি বালিকা সাবিত্রীর মত হবার উচ্চাভিলাষ পোষণ করে। দ্রৌপদী পাঁচ ভাইকে বিয়ে করে, পাঁচ ভাইএর সাধারণ পত্নী, এখানে স্পষ্টতঃ সেই নারীর বহু পতি বিবাহ প্রথাভিত্তিক সমাজের রীতির একটা ঘটনা। এসব লোকবিশ্বাস বহু প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ছিল। আমরা দেখতে পাই যে, মহাভারতের মূল কাহিনির সঙ্গে এমন অনেক কাহিনি স্থান পেয়েছে, যার সঙ্গে মহাভারতের মূল কাহিনির আপাত কোন সম্পর্ক নেই। আসলে বিশেষ বিশেষ সময়ে এইসব লোককথাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। চতুরাশ্রমের কর্তব্য, বিবাহবিধি, দানবিধি—ভীষ্মের উপদেশগুলির ভিত্তি নিঃসন্দেহে প্রাচীন ঋষিদের কথিত নীতিশিক্ষা, বলাবাহুল্য লৌকিক প্রাচীন ঐতিহ্য ও লোকসমাজ। তাছাড়া 'হাঁস ও কাকের বৃত্তান্ত', 'শকুন ও শেয়ালের কথা', 'কুকুর ও শরভের কথা', 'পায়রা ও ব্যাধের কথা', 'বেড়াল ও ইঁদুরের কথা', 'শিমূল গাছ ও হাওয়ার কথা', 'নদী ও সাগরের কথা' — এ ধরনের মনুষ্যতর প্রাণী ও প্রকৃতিকে নিয়ে অনেক কথা পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরদের শুনিয়েছেন। ভীষ্ম এই সমস্ত কথার আশ্রয় নিয়েছেন কোন না কোন দার্শনিক রাজনৈতিক-কূটনৈতিক সামাজিক সমস্যার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে। যেখানে তত্ত্বকথায় বিষয়ের জটিলতার অবসান হয় না, সেখানে তথ্যসমৃদ্ধ লোককথার সহজ সাধারণ উদাহরণ দিয়ে জটিলতর বিষয়কে সহজবোধ্য করার প্রয়াস নিয়েছেন প্রাজ্ঞ পিতা পিতামহ ভীষ্ম। আর এই সমস্ত কাহিনি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, এগুলির উপাদানের উৎস লৌকিক ঐতিহ্য এবং লোকসমাজ। বস্তুতঃ মহাভারত প্রাচীন আর্যদের জীবনধারা ও জ্ঞানের বিশ্বকোষস্বরূপ এবং তাতে সমগ্র প্রাচীন ভারতবর্ষই উপস্থাপিত হয়েছে।

নিরক্ষর লোকসমাজ যে অসাধারণ বিস্ময়কর স্রষ্টা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত সংকলিত -সম্পাদিত সংস্কৃতে অনূদিত—'পঞ্চতন্ত্র'। বিশ্বের লোককথা সংগ্রহের ইতিহাসে এক পরম বিস্ময়। অন্যতম লোককথা সংগ্রাহক পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা লোকসমাজ থেকে সংগ্রহ করে অসীম পরিশ্রমে সম্পাদনা

করে লোককথাগুলিকে লিখিত রূপ দিয়েছেন পঞ্চতন্ত্রে। বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র—পাঁচটি তন্ত্রের সমাহার। ৮৪টি লোককথাকে তিনি পাঁচটি ভাগে বিভাজন করেছেন—মিত্রভেদম, মিত্রপ্রাপ্তিকম্, কাকোলূকীয়ম্, লব্ধপ্রণাশম্ এবং অপরীক্ষিত কারকং। পঞ্চতন্ত্রে মোট লোককথার অর্ধেক (১৭+৪+১০+৮+৩ =৪২টি) পাত্রপাত্রীতে নানা ধরনের পশুপাখি। পঞ্চতন্ত্রের সংকলন কাল সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন মত প্রকাশ করে থাকেন। প্রখ্যাত সমালোচক হারটেল মনে করেছেন যে, পঞ্চতন্ত্র সর্বপ্রথম কাশ্মীরে ২০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে সংকলিত হয়েছিল। রেমণ্ড ডেলয় জেসন বলেছেন, পঞ্চতন্ত্র খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীতে সংকলিত। আবার লিলিয়াণ হারল্যান্ডস হরণস্টেইন বলেছেন, পঞ্চতন্ত্র ২০০ থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দে সংকলিত হয়েছিল। সুতরাং আমরা বলতে পারি দু'শ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে পঞ্চতন্ত্র সংকলিত।

পঞ্চতন্ত্রের কাহিনিগুলির অন্তর্নিহিত ভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ কাহিনিতেই ফুটে উঠেছে সাধারণ গ্রামীণ মানুষের হাহাকার, বেদনা, তিক্ততা, ব্যর্থতা — জীবনসংগ্রাম ও অসহায়তা। তাছাড়া পশুপাখিকেন্দ্রিক কাহিনিগুলি নীতিশিক্ষামূলক লোককথা। লোককথার যে আশ্চর্য সঞ্জীবনী ও সম্মোহিনী শক্তি রয়েছে তা পঞ্চতন্ত্রের কাহিনিতে স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। একটি কাহিনী শুরু হল, মাঝে একাধিক কাহিনি মালার মত গাঁথা রইল, একেবারে শেষে মূল কাহিনির সমাধান। আরম্ভ থেকে শেষ না করে উপায় নেই, উপরন্তু আকর্ষণের জন্য মাঝে উপকাহিনিগুলি পাঠকের উপরি পাওনা। অর্থাৎ একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামোর মধ্যে বহু বিচিত্র কাহিনির সমাহার। সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, সহস্রবুদ্ধির বিপদ, নীল বর্ণ শৃগাল, বোকা হাতি, সিংহ, উট ও কাক, বিশ্বস্ত বেজি—ইত্যাদি কাহিনিগুলির অন্তর্নিহিত ভাব লোকসমাজকেই মনে করিয়ে দেয়। তাই লোকসমাজের লোককথার একটি অনন্য সংকলন রূপে পঞ্চতন্ত্র তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার দলিল।

সমগ্র বিশ্বের প্রাচীনতম লোককথার সংকলনগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় সংকলন গ্রন্থ হিসেবে 'জাতক' পরিচিত। 'অপার বিভূতি সম্পন্ন সম্যকসমুদ্ধ'—গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মগুলির বৃত্তান্ত হিসেবে জাতকের গল্প বিশ্বাস অর্জন করেছে। এক কথায় জাতকের মূল উদ্দেশ্য ধর্মীয় উপদেশ দান। গৌতম বুদ্ধের জীবনকাল ৫৬৩—৪৮৩ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ। সুতরাং জাতকের মূল কাঠামো এই সময় সীমায় সংকলিত। কিন্তু প্রশ্ন হল — মূল কাঠামো যদি এই সময় সীমার মধ্যে সংকলিত হয়, তবে সমগ্র জাতক গ্রন্থের সংকলন কবে হয়েছিল? আর গৌতম বুদ্ধই যে সমগ্র জাতকের স্রষ্টা তারই বা বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায়? জাতকের অর্ধেক কাহিনি যেমন বৌদ্ধ প্রভাবহীন, তেমনি বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মবাদের সঙ্গে এগুলি সম্পর্কহীন। ফসবৌলের সংকলিত জাতকে মোট জাতক

সংখ্যা — ৫৪৭। ই. বি. কাওরেল কর্তৃক পালিভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদিত জাতকের জাতক সংখ্যা ৫৪৭। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধশাস্ত্রে জাতক সংখ্যা—৫৫০টি। তিব্বতি জাতকমালায় জাতকের কাহিনি সংখ্যা ৫৬৫টি। উদীচ্য সংস্কৃত জাতক মালায় রয়েছে মাত্র ৩৪টি জাতক। অনেকের মতে উদীচ্য সংস্কৃত জাতকের জাতকগুলিই আদি জাতক। আবার 'মহাবস্তু' গ্রন্থে জাতকের সংখ্যা ৮০টি। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি জাতকের আকার, জাতকের সংখ্যা বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। ধর্মপ্রবক্তা গৌতম বুদ্ধের সংকলন হলে, অন্তত ধর্মীয় কারণেই জাতকের সংখ্যাটা এত পরিবর্তিত হওয়ার কথা নয়। তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে, সংকলক বা কথকগণ নানা সময়ে লৌকিক ঐতিহ্য, লোকসমাজ থেকে কালে কালে জাতকের কাহিনিগুলি সংকলিত করেছিলেন!

আমরা দেখতে পাই যে, জাতকে অসংখ্য পশু-পাখিকেন্দ্রিক কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রে, সোমদেবের কথাসরিৎসাগর-এ, হিতোপদেশ এবং ঈশপের নীতিকথায়। তাহলে কি অন্য সংকলনগুলোর অনেক আগেই জাতকের সংকলন হয়েছিল? কিংবা জাতকের সংকলন থেকে এগুলো অন্যান্য সংকলনে সংকলিত হয়েছে? আমরা জানি জাতকের অন্যতম উদ্দেশ্য ধর্মীয়, তাই লৌকিক কাহিনি ব্যবহারের পাশাপাশি ধর্মীয় দর্শনকেও প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। সুতরাং ধরে নিতে পারি যে, লৌকিক উৎসজাত এই সমস্ত কাহিনি, গল্পকথা নিজ নিজ সংকলনের প্রয়োজনেই সংকলকগণ সংগ্রহ ও সংকলিত করেছিলেন। লক্ষ্যণীয় বিষয়, জাতকে উল্লেখিত পশু-পাখি ইতর প্রাণীরূপে পরিগণিত নয়, তারা ভিন্ন জন্মে মানুষ ছিল — এই ধারণাকে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা আদিম বিশ্বাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শৃগাল, শূকর, কচ্ছপ, শুক, উলূক, কাক, বিড়াল, শশ, মহাকপি, কুক্কুট, মৎস—প্রভৃতি জাতকের গল্পগুলিতে যে লৌকিক পশুপাখির কাহিনি ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করেছে তা বলাই বাহুল্য, তার উদ্দেশ্য একটাই লৌকিক লোককথার আশ্রয়ে সহজ-সরলভাবে ধর্মীয় উপদেশ ও নীতিশিক্ষা দান।

রামায়ণ, মহাভারত, জাতক, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, হিতোপদেশ, ঈশপ প্রভৃতি প্রাচীন সংকলনগুলি কালের পরিক্রমায় পরিবর্ধন, পরিমার্জন, বিবর্তনের ধারায় কোথাও ঘটেছে লৌকিক রূপায়ণ, কোথাও বা সমন্বয়। আবার কোথাও বা প্রাক্-পৌরাণিক প্রাগৈতিহাসিক গল্পও বিবর্তনের চিহ্ন নিতে নিতে প্রবহমান। তাই কোন অরণ্যচারী জনগোষ্ঠী কিংবা কোন একজন অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের মুখে যদি আমরা কোন প্রাচীন সংকলন গ্রন্থের কোন কাহিনি শুনতে পাই তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ এই সমস্ত সাহিত্যিক ধারার গল্প-কথা- কাহিনি মৌখিক ভাবে বংশ পরম্পরায় প্রচারিত হয়ে ধারাবাহিকতা লাভ করতে পারে কিংবা আদি কালের কাহিনির বিবর্তনও ঘটতে পারে সাহিত্যিক ধারায়। আবার প্রাচীন সংকলনগুলির কোন কাহিনি কোন অক্ষরজ্ঞানহীন গ্রামীন

মানুষের মুখে যদি শোনা যায়, তবে তার উৎস যে উক্ত গ্রন্থাদি—একথাও নিশ্চিতভাবে বলা বোধ হয় ঠিক নয়, কারণ একই উৎস থেকে তা যেমন সাহিত্যিক ধারায় গিয়ে পৌঁছেছে তেমনি লৌকিক ধারাতেও অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

বৈদিক যুগেরও বহুকাল আগে থেকেই দ্রাবিড়-কিরাত-নিষাদ বর্গীয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে যে সব লোককথা প্রচলিত ছিল তার বেশ কিছু অংশ আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধ জৈন সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে যায়। আবার সেই সব কাহিনি পরিবর্তিত হয়ে মূল উৎসের দিকে ফিরে গিয়ে প্রাক্-বৈদিক সংস্কৃতির মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আদৃত হয়। পূর্বোক্ত আলোচনার পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, লোককথার মূল উৎস বেদ নয়, পুরাণ নয়, রামায়ণ-মহাভারত নয়, কিংবা সংকলিত কোন প্রাচীন গ্রন্থও নয়; লোককথার মূল উৎস প্রাক্‌বৈদিক এবং প্রাগৈতিহাসিক, যার ঐতিহ্যিক ধারা সংখ্যাহীন শিকড়ের মতো বিস্তৃত হয়ে আছে জন মানবের মধ্যে।

বাংলার লোককথার ইতিবৃত্তের রূপরেখা

বাংলা তথা ভারতবর্ষ লোককথা-লোককাহিনি, লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার মতো লোককথা চর্চার ক্ষেত্রেও ইউরোপীয়ানদের অবদানকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ইউরোপীয়ানগণ বাংলার মাটিতে পদার্পণের প্রথম লগ্ন থেকেই এদেশের নৃতত্ত্ব জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে উৎসাহিত হয়েছিলেন। আসলে ইউরোপীয়ানগণ এদেশের লোকঐতিহ্য সংগ্রহ করতে তৎপর হয়েছিলেন শ্রদ্ধায় বা আকর্ষণে নয়, নিতান্তই স্বার্থে, বলা বাহুল্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণেই। ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার। বাংলায় এসে তাঁরা বুঝতে পারেন বাংলার বাঙালিরা একান্তই ধর্মভীরু জাতি। সুতরাং বাংলার মানুষের মর্মস্থলে আঘাত করতে হলে ধর্মের আশ্রয় নিতে হবে। তাই খ্রিস্টধর্ম প্রচারের স্বার্থেই তাঁরা স্থানীয় জনগণের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, লোকধর্মের সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন; এবং সেজন্যই লোকঐতিহ্যকে অবলম্বন করে ধর্মীয় প্রসার ও প্রচারে ইউরোপীয়গণ তৎপর হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রা সার্থকভাবে উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থা কায়েম করার জন্য ঔপনিবেশিক শাসনকর্তারা দেশীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণে এবং তার সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে চেয়েছেন।

বাংলার লোককথা সংগ্রহ ও চর্চার ইতিহাসে যে দু'জন ইউরোপীয়ান বিশেষভাবে স্মরণীয়, তাঁরা হলেন—জি.এইচ্. ড্যামান্ট ও এডওয়ার্ড টোয়েট ডেল্টন (Edwad Tweit Delton) এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে হয় কলকাতা থেকে প্রকাশিত ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের দু'টি পত্রিকার কথা—'The Indian Antiquary' এবং 'Descriptive Ethnology of Bengal.' জি.এইচ্. ড্যামান্ট সর্বপ্রথম 'The Indian Antiquary' পত্রিকায় মোট ২২টি লোককথা প্রকাশ করেন। আর Edwad Tweit Delton লোককথা সংগ্রহ ও চর্চার জন্য বিখ্যাত 'Descriptive Ethnology of Bengal' - তুলনামূলক আলোচনায়। বঙ্গের নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতত্ত্ব জরিপের ক্ষেত্রে ড্যামন্ট ও ডেল্টন যতটা না পরিচিত, ততোধিক পরিচিত একটা নতুন বিষয়কে জনসমক্ষে বিশেষত পাশ্চাত্য বিদ্বজ্জনের সামনে তুলে ধরার জন্য।

বাংলার লোকঐতিহ্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য অন্য যে দু'জন ইউরোপীয়ান স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁরা হলেন — জাতিতত্ত্ববিদ এইচ্. এইচ্. রিসলে এবং উইলিয়াম ম্যাককুলেচ্। রিসলে রচিত 'The Tribes and Customs of Bengal' ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটি মূলত বাংলার জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত গ্রন্থ হলেও অনেক স্থানীয় লোককথা স্থান পেয়েছে।

খ্রিস্টান মিশনারী উইলিয়াম ম্যাক্কুলেচ-এর সংকলিত লোককাহিনি 'Bengali House hold Tales' ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। মোট ২৮টি লোককথা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। তাঁর সংগৃহীত লোককথাগুলি মৌখিক ঐতিহ্য থেকে সংগৃহীত। সংগৃহীত প্রতিটি লোককথার সমান্তরাল লোককথা থাকায় তুলনামূলক আলোচনার, —বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম প্রয়াস সংকলনটিতে পাওয়া যায়।

'ফোর্ড উইলিয়ম কলেজের' বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান উইলিয়াম কেরীর —'ইতিহাসমালা' (১৮১২) মূলত লোককথার সংকলন। কেরীর ইতিহাসমালা ১৫০টি লোককাহিনির সংকলন । 'ইতিহাসমালা'য় পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ থেকে যেমন গল্প সংকলিত হয়েছে তেমনি বাংলার প্রচলিত উপকথাও সংকলিত হয়েছে। আমরা উইলিয়ম কেরীকে বাংলা লোককথার প্রথম সংগ্রাহকও বলতে পারি কারণ কেরীর সংকলনেই সর্বপ্রথম বঙ্গদেশের প্রচলিত লোককথা স্থান পেয়েছে।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে/বাংলার লোককথা সংগ্রহের জন্য রেভারেন্ড লাল বিহারী দে (১৮২৪-'৯৪) স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। তাঁর অন্যতম অবদান বাংলা তথা বঙ্গবাসীর প্রচলিত লোককথাকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। রেভারেন্ড লাল বিহারী দে'র 'Folktales of Bengal' ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজিতে রচিত হয়ে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। লাল বিহারী দে'কে এই লোককথা সংকলনে অনুপ্রাণিত করেছিলেন আর. সি. টেম্পল।

বাংলা ছড়া এবং অবিমিশ্র লোককাহিনির অন্যতম সংকলক হিসেবে আমরা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম স্মরণ করতে পারি। খাঁটি বাঙালির খাঁটি লোককথার সংকলক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'ছেলে ভুলানো গল্পের তরঙ্গ' পর্যায়ের লোককথার সংকলন 'রাক্ষস-খোক্ষস' (১৩০৪ সাল)। আঞ্চলিক ভাষার অবিকৃত স্বাদ তাঁর লোককথার সংকলনটিতে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

পরাধীন ভারতবর্ষের বাংলা লোককথা সংগ্রহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যাঁর ভূমিকা তিনি 'কথা সাহিত্য সম্রাট' দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। 'ভারতী' পত্রিকায় ১৯০৬ সালে তাঁর বিখ্যাত সংগ্রহ 'পুষ্পমালা' প্রকাশ করেন স্বর্ণকুমারী দেবী। পরে ১৯০৮, ১৯০৯ এবং ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে প্রকাশিত হয় লোককথার সংকলন গ্রন্থ—'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি', 'ঠানদিদির থলে'। লোককথার প্রতিবেশ সৃষ্টি এবং মোহসৃষ্টিতে কথ্যভাষার ব্যবহার নৈপুণ্যে লোককথাগুলি সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলা নৈপুণ্যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

'উপকথা' গ্রন্থটি দুইখণ্ডে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। সংকলক জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত। দু'টি খণ্ডেই ১৩টি করে গল্প সংকলিত হয়েছে। 'উপকথা' নামকরণ খুব সম্ভবত সংকলক 'লোককথা' অর্থেই ব্যবহার করেছেন। কারণ শুধু পশু-পাখিকথা—উপকথাই নয়, সংকলনে —রাজপুত্র,সদাগরপুত্র, শঙ্খ কুমারের কাহিনিও সংকলিত হয়েছে।

'বাংলা লোককথা'র ইতিহাসে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী একটি স্মরণীয় নাম। উপেন্দ্র কিশোর মূলত শিশু সাহিত্যিক হলেও লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাসে তিনি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। লোকসাহিত্যের তাঁর অনবদ্য রচনা—'টুনটুনির বই' (১৩১৭)। 'টুনটুনির বই' সর্বমোট ২৬টি লোককাহিনির সংকলন। অধিকাংশ গল্পের কাহিনিতে মানুষ ও প্রাণী একই সঙ্গে স্থান পেয়েছে। অবিমিশ্র মনুষ্যেতর প্রাণী—বাঘ, হাতি, শেয়াল, কুকুর এবং কাক, টুনটুনি—প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে রচিত গল্পের সংখ্যা ১৭। পশু পাখিও যে লোককথার অন্যতম চরিত্র হতে পারে উপেন্দ্রকিশোরের রচনায় তা সার্থকতা লাভ করেছে।

'চৌধুরী বাড়ির শিশুরা কিন্তু উপকথা না শুনিয়া বৃদ্ধা চৌধুরী গিন্নীকে ছাড়িত না বলিয়া তিনি তাহাদিগকে গল্প শুনাইতে কৃপণতা করিতেন না।... কোনদিন একটি, কোনদিন দুইটি, গল্প ছোট হইলে কোনদিন তিনটিও বলিতেন। আমরা সেই গল্পগুলি ক্রমশঃ 'পিসিমার গল্প' নাম দিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।' 'পিসিমার গল্প'—লেখক অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তার সংকলিত গল্পগুলি পিসিমার মুখের সেই উপকথা। 'পিসিমার গল্প' দুইখন্ডে ১৩২০ এবং ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত, প্রথম খন্ডে ৯টি এবং দ্বিতীয় খন্ডে ১১টি গল্পের সংকলন দু'টি লোককথারই সংকলন।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে এবং দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের অনুসরণে শ্যামাচরণ দে রচনা করেন 'বঙ্গের উপকথা' (২য় সংস্করণ, ১৯১৫)। রচনাটিতে পশুপাখির কথার সঙ্গে মানুষের

কথাও স্থান পেয়েছে। তাই মনে হয় লেখক 'উপকথা' শিরোনামটি ব্যবহার করে বৃহত্তর অর্থে 'লোককথা'কেই নির্দেশিত করেছেন।

সাধুভাষায় রচিত ১৮টি গল্পের সংকলন (চারখণ্ডে) 'ঠাকুরদাদার রূপকথা'-র (প্রকাশকাল ১৯২২) সংকলক কালীমোহন ভট্টাচার্য। লোককাহিনির এই সংকলনের গুটিকয়েক বাদ দিলে অধিকাংশের কাহিনি লোককথার পর্যায়ভুক্ত। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত একটি ছোট পুস্তিকা— 'শিরণী' যার প্রণেতা প্রখ্যাত লোকসংগীত সংগ্রাহক মহম্মদ মনসুরউদ্দীন। অধুনা বাংলাদেশের পাবনা-র প্রাদেশিক ভাষায় রচিত লোককথার একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন।

বাংলা লোকসাহিত্যের অঙ্গনে বাংলা লোককথা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা লোকসাহিত্য' (মোট চার খণ্ড) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত, সর্বমোট ২৯০টি গল্পের সংকলন, প্রকাশকাল ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ। সমাজবিজ্ঞান সম্মত প্রয়াস আলোচ্য গ্রন্থেই সর্বপ্রথম অনুসৃত হয়। লোককথা যে শুধু মাত্র মনোরঞ্জনের বিষয় নয় ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের বিজ্ঞান নির্ভর সচেতনতামূলক এই সংকলনটি তারই প্রমাণ। লোককথা সংগ্রহের স্থান-কাল-পাত্রের নির্দেশ, লোককথার শ্রেণিকরণ, অধ্যায় বিন্যাস, অভিপ্রায় নির্ণয়, সর্বোপরি ভাষার অবিকৃত রূপ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের পাঠান্তর নির্দেশ—লোককথার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবনে বিশেষ ভাবে সহায়ক হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং তাঁর 'বাংলা লোকসাহিত্য' বাংলা লোকসাহিত্যের পথ -প্রদর্শক।

"প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ ঃ লোকসাহিত্য" (২য় পর্ব, ১৯৮৩) সংকলক ড. গিরিজাশঙ্কর রায়। আলোচ্য গ্রন্থে মোট ১৪টি লোককথা সংকলিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের প্রচলিত লোককথার এই সংকলনটিতে লোককাহিনিগুলি বাংলা ভাষায় বর্ণিত হলেও সংলাপের ক্ষেত্রে রাজবংশী সমাজের প্রচলিত ভাষাকে অনুবাদসহ লেখক ব্যবহার করেছেন। সমাজবিজ্ঞান নির্ভর প্রয়াসের অভাবে 'প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ ঃ লোকসাহিত্য' রস আস্বাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করলেও ড. রায়ের প্রয়াস নিঃসন্দেহে মহান।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রচলিত লোককথা সংগ্রহের অন্যতম প্রয়াস আমরা দেখতে পাই তপন রায় প্রধানের 'রাজবংশী লোককথা' গ্রন্থটিতে। সর্বমোট ২১টি গল্পের সংকলনটি প্রকাশিত হয় কোলকাতা বইমেলা ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে। তপন রায় প্রধানের সংগৃহীত লোককথাগুলির কিছু কিছুর সঙ্গে ড. গিরিজা শঙ্কর রায়ের সংগৃহীত লোককথার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া বিজ্ঞান -নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে 'রাজবংশী লোককথা' হয়েও 'লোককথা'র সংকলনে পরিণত, তবুও তপন রায় প্রধানের প্রচেষ্টা মহৎ।

লোককথার সংজ্ঞা-স্বরূপ

সংস্কৃতি মানুষের জীবন ধারারই বিশিষ্ট অভিব্যক্তি। সমাজ বিকাশের ধারায় এবং জীবন-যাপন পদ্ধতির বৈচিত্র্যের জন্য ইতিহাসের পটভূমিতে সংস্কৃতির প্রধানত তিনটি রূপের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে—

ক) আদিম সংস্কৃতি বা Primitive Culture.

খ) লোকসংস্কৃতি বা Folklore Culture.

গ) উচ্চ সংস্কৃতি বা Higher Culture.

সংস্কৃতির এই বিভিন্নতা ত্রিবিধ সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ, বহন ও প্রতিফলন করে।

আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিকাশের স্তরভেদানুসারে সংস্কৃতির যে রূপভেদ —তারই একটি বিশিষ্ট বিভাগ লোকসংস্কৃতি। সাধারণভাবে বলা যায়, লৌকিক সংহত সমাজের সমষ্টিগত জীবন প্রয়াসের সামগ্রিক কৃতিই লোকসংস্কৃতি। মোটামুটিভাবে আমরা লোকসংস্কৃতির তিনটি শর্তের কথা উল্লেখ করতে পারি।

ক) যৌথ শ্রম প্রক্রিয়া বা জীবন প্রয়াস

খ) সমষ্টি চেতনা বা সমবেত আবেগ

গ) সামাজিক স্বীকৃতি বা সর্বজনগ্রাহ্যতা।

লোকসংস্কৃতির মধ্যে সমষ্টিগত আবেগ, সমবেত প্রয়াস ও সর্বজনগ্রাহ্যতাই মুখ্য। এই সমষ্টিগত আবেগ, সমবেত সৃজনশীল প্রয়াস এবং সর্বজনগ্রাহ্যতার মৌল ত্রিধারার আবর্তে লোকসংস্কৃতির মধ্যে সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিগত প্রয়াস সতত সমষ্টিগত সৃষ্টিতে রূপ লাভ করে।

লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের ইতিহাস পরিক্রমায় দেখা যায় পুরাতনী চর্চার হিসেবে লোক

সংস্কৃতিচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। সুদীর্ঘকাল থেকে বিষয়টিকে জনপ্রিয় পুরাতনী চর্চার বা 'Popular antiquity' নামে অনুশীলন করা হোত। সুদীর্ঘকাল লোকসংস্কৃতিতে কৃষিভিত্তিক গ্রামকেন্দ্রিক পিছিয়ে পড়া সমাজের অক্ষরজ্ঞানহীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবাহিত প্রাচীন ঐতিহ্যময় বিষয় রূপে গণ্য করা হ'ত। কালক্রমে প্রাচীনতম 'Popular antiquity' শব্দটির সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য 'Folklore' শব্দটি চয়ন ও গ্রহণ করা হয়। 'Folklore' শব্দটি অবিমিশ্র নয়, এটি একটি সংযুক্ত 'স্যাক্সন সমন্বিত শব্দ' (Saxon Compound)'। লোকসংস্কৃতি তথা 'Folk-lore'-এর স্বরূপ সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'Folk' ও 'lore' শব্দদ্বয়ের তাৎপর্যগত লোকসাংস্কৃতিক বিজ্ঞানসম্মত অর্থ, বিশেষ ভাবে অনুধাবনযোগ্য।

'Folklore' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানী উইলিয়াম থমস্ 'The Athenacum''(No.882/August, 22,1846/pp 862-63) নামক একটি পত্রিকায় তাঁর লিখিত একটি প্রবন্ধে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে 'Folklore Society' প্রতিষ্ঠিত হলে সেই সোসাইটির মুখপত্র 'Folklore Records' ও পরবর্তীকালে 'Folk-lore' নামে পরিচিত পত্রিকাটির মাঝখানে একটি 'হাইফেন' (-) দিয়ে শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীকালে এই মাঝের 'হাইফেন' তুলে দিয়ে শব্দটিকে একটি /একক শব্দে রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমানে 'Folklore' শব্দটি 'একক শব্দ' রূপেই পরিচিত এবং প্রচলিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কোন কোন জার্মান পণ্ডিতের মতে 'Folklore' শব্দটি জার্মান 'Volkskunde' শব্দের ইংরেজি অনুবাদ মাত্র। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে জার্মান ভাষায় 'Volkskunde' শব্দটি প্রচলিত। জার্মান 'Volch' এবং ইংরেজি 'Folk' শব্দটির উচ্চারণগত ও অর্থগত সাদৃশ্য স্বীকৃত।

জার্মান 'Volk' এবং ইংরেজি 'Folk' শব্দটি 'জাতি' অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বাংলায় শব্দার্থ সংকোচনের জন্য 'জনসাধারণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। জার্মান ভাষাভাষীগণের মতে 'Volch' এর অর্থ 'Common People' বা 'সাধারণ গণসমাজ'; প্রাচীন জীর্ণ জীবন ব্যবস্থার মধ্যে যে জনজাতি এখনো আবদ্ধ রয়েছে, ইংরেজিতে যাদের বলা যেতে পারে 'Primitive People', কিন্তু যাদের ঠিক 'Primitive' বলা চলে না অথচ রীতি-নীতি, চাল-চলনে যাদের প্রাচীনতার ধারা এবং ঐতিহ্য বর্তমান—সেই সমাজকে জনসাধারণের বা লোক ('Folk') -এর সমাজ বলা চলে। 'Folk- 'A group of associate people, a Primitive kind of Post-tribal social organisation; The lower classes or common people of an area.' আমেরিকার সমাজ বিজ্ঞানী নৃবিজ্ঞানীগণও মৌলিক সংস্কৃতির

অধিকারী মানবগোষ্ঠীকে বোঝানোর জন্য 'Folk' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। মোটকথা 'Folk' শব্দটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে যা পাওয়া যায় তার গূঢ় উদ্দেশ্য প্রায় একই—'সাধারণ মানবসমাজ' যাদের ঐতিহ্যমুখী জীবন ব্যবস্থা, চাল চলন, রীতি-নীতি, চিন্তাধারা—এগুলোর আমূল কোন পরিবর্তন হয়নি, বা বলা যায়, সভ্যতার আলোক প্রবেশ করলেও সেই সমাজের কাঠামো মূলত 'Tradition' বা ঐতিহ্যের পটভূমিতে বর্তমান।

'Folklore'-শব্দটির 'lore' প্রাচীন ইংরেজিতে ছিল 'lar' ডাচ ভাষায় 'lair' এবং জার্মান ভাষায় 'lehre' প্রাচীন টিউটনিক ভাষায় শব্দটি ছিল 'laiza' (from of routelies compare Learn verb.) Old saxon old high German পর্যায়ে শব্দটি ছিল 'lera' যার উৎস Germanic Laizo থেকে, ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে 'Lais' শব্দটি মূলে ছিল। বুৎপত্তিগত অর্থে 'লোর' এর অর্থ শিক্ষা, নীতি বা জ্ঞান। আভিধানিক অর্থ—

1) The act of teaching, the condition of being taught, instruction, a piece of instruction, a lesson.

2) That which is taught doctrine, applied chiefly to religious doctrine. The body of traditional facts of beliefs relating to some subjects as animal, bird, fairy plant. (The shorter oxford English Dictionary, The Standard Literature com. Pvt. Limited, kolkata, 1970, p-1169).

বলা যায়, যে-শিক্ষা ঐতিহ্যগত, যে-জ্ঞান ধর্মগত, যে-বিশ্বাস ঐতিহ্যগত-বংশপরম্পরায় পশু-পাখি গাছপালা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। 'lore'- শব্দের প্রতি এরকম একটি ধারণা আমরা করতে পারি যা ঐতিহ্যগত ভাবে লোকগণ মুখে মুখে শেখে বা শিক্ষালাভ করে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার নিরিখে আমরা বলতে পারি যে, 'ফোকলোর' (Folk-lore) শব্দটির প্রথমাংশ 'ফোক' (Folk) যার অর্থ 'সাধারণ মানুষ' বা 'জনসমষ্টি' এবং শব্দটির দ্বিতীয়াংশ 'লোর' (lore) যার অর্থ 'জ্ঞান' বা 'শিক্ষা'। নৃতত্ত্ববিদগণ ফোকলোর অভিধায় 'Varbal Art' বা 'oral literature' তথা মৌখিক শিল্প বা অলৈখিক লোকসাহিত্যকেই লোকসংস্কৃতি রূপে গণ্য করেছেন। 'ফোকলোর'এর বাংলা প্রতিশব্দ অন্বেষণে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ বিভিন্ন সময়ে যে সকল পরিভাষা ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

প্রস্তাবক	প্রতিশব্দ
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	লোকযান
ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য	লোকশ্রুতি
ড. সুকুমার সেন	লোকচর্চা
ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক	লোকচারণা
ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ্	লোকবিজ্ঞান
ড. মযহারুল ইসলাম	ফোকলোর
ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়	লোককৃতি।

লোকসংস্কৃতির পরিভাষায় লোকসমাজের সামগ্রিক অভিব্যক্তি সমূহকে সাধারণত দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—

ক) বস্তু কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি (Material Folklore)

খ) বস্তু নিরপেক্ষ লোকসংস্কৃতি (Non-Material Folklore)

মূলত ভাষা নিরপেক্ষ মানুষের সৃষ্টিশীলতার দ্বারা সৃষ্ট বস্তুসামগ্রিই বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি এবং ভাষাশ্রয়ী সৃষ্টিশীল বিষয় সমূহই বস্তুনিরপেক্ষ লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির বহু বিচিত্র বর্ণময় বিষয়সমূহকে আমরা প্রধানত চারটি ধারায় বিভক্ত করতে পারি —

১. লোকসাহিত্য

২. লোকাচার-লোকানুষ্ঠান (ধর্মলোকাচার, পালাপার্বণ, সংস্কার, পূজানুষ্ঠান, উৎসব প্রভৃতি)

৩. লোকশিল্প বা শিল্পগত ফোকলোর (ব্যবহারিক উপকরণ, রান্নাবান্না, পোশাক, যানবাহন, আসবাবপত্র, গৃহস্থাপত্য ইত্যাদি)

৪. লোককারিগরি ও লোকবিজ্ঞান (ঝাড়ফুঁক, চিকিৎসা, ঔষধপত্র, তাবিজ-কবচ ইত্যাদি)।

লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য বা 'Folkliterature' সাধারণ মানুষের সমাজ-সংস্কৃতির বিশ্বস্ত দর্পণ। সাধারণভাবে লোকসাহিত্যকে 'Verbal Art' বা মৌখিক শিল্পরূপে গণ্য করা হয়। জাতীয় জীবনের বস্তুভাবনা ও রস-সংস্কারের লৌকিক ঐতিহ্যকে আশ্রয় করেই লোকসাহিত্য বিকশিত হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে লোকসাহিত্য যে কোন দেশের লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বিভাগ। প্রচলিত সংজ্ঞানুসারে লোকসাহিত্য সংহত সমাজের অক্ষর-জ্ঞানহীন জনমানুষের মৌখিক ধারায় রচিত এবং বংশপরম্পরায় শ্রুতি ও স্মৃতিবাহিত স্বতঃস্ফূর্ত সমষ্টিগত ঐতিহ্যমূলক সৃষ্টি।

লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

ক) ঐতিহ্যমূলক সমষ্টিগত প্রকাশ,
খ) মৌখিক ভাষাশ্রয়ী অলিখিতরূপ,
গ) কৃষিনির্ভর গ্রামকেন্দ্রিক সমাজের সৃষ্টি,
ঘ) ব্যক্তি পরিচয়হীন অনির্দিষ্ট রচনা,
ঙ) নমনীয় ও পরিবর্তনশীল প্রয়াস,
চ) সহৃদয় সর্বজনীন সমাজের আস্বাদনীয়।

লোকসাহিত্যের শ্রেণিবিভাগ

লোকসাহিত্যকে আমরা মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণিতে বিভাজিত করতে পারি। প্রতিটি শ্রেণি আবার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। প্রতিটি শ্রেণির প্রকাশও একই রকম নয়, যার কতকগুলি কাহিনির আশ্রয়ে প্রকাশ পায়, কতকগুলি গুরুভার ব্যঞ্জক এবং কতকগুলি প্রকাশিত হয় সুরের আশ্রয়ে। মোটামুটিভাবে লোকসাহিত্যের শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ ঃ—

লোককথা, গীতিকা, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া ও গান ইত্যাদি।

এবার আমাদের আলোচ্য বিষয়— লোকসাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধতর শ্রেণি 'লোককথা'।

লোককথার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

আভিধানিক অর্থানুসারে লোককথা হল সে সব কথা—যা মুখে মুখে বংশ-পরম্পরায় নিরক্ষর গ্রামবাসীদের দ্বারা কথিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে।

বছরের পর বছর এই লোককথাগুলি লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে সমাজে ধারাবাহিকতা (Continuity) লাভ করেছে। যেহেতু লোককথা লিখিত পুস্তকাদিতে প্রকাশিত নয়, তাই মুখে মুখে প্রচারিত হতে হতেই লোককথায় অনেক পরিবর্তন বা রূপান্তর (Variation) পরিলক্ষিত হয়, এবং সে কারণেই অনেক সময় একই লোককথার একাধিক ভাষ্য পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী লোককথাগুলিকে সম্যক যাচাই করে নিয়ে নির্বাচন (Selection) করে, কারণ এই লোককথার মধ্যেই সেই জনগোষ্ঠীর তাদের মননের অনুভূতি, প্রেম, সুখ-দুঃখ প্রকাশের রসদ খুঁজে পায়। আর সেজন্যই লোককথাগুলি মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে বছরের পর বছর বংশানুক্রমে কথিত হয়ে আসছে।

'লোক-কথা'র প্রাণই হ'ল 'কথা'—কথা ছাড়া লোককথা হয় না, অন্য কিছু দিয়ে পূরণ করাও যায় না, সেখানে 'কথা'রই ঠাসবুননি। সেই বৈদিক সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে চার হাজার বছরের কাল পর্যন্ত অসংখ্য কাহিনি বিভিন্ন নামে অভিহিত হলেও 'কথা' শব্দটি আনুকূল্য লাভ করেছে। 'কথা'—শব্দটির প্রয়োগ খ্রিস্টপূর্ব সাত'শ অব্দে। তার প্রমাণ গুণাঢ্য রচিত পৈশাচী ভাষায়—'বৃহৎকথা'। বৃহৎকথার কাহিনিগুলোকে যথার্থই 'কথা' হিসেবে আমরা মেনে নিতে পারি, কারণ বৃহৎকথার ধর্মীয় অনুষঙ্গ গৌণ, সেখানে কথাই মুখ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বৃহৎকথায় কাহিনির সমার্থক তিনটি শব্দ—'অবধূত কথা' অর্থাৎ বিস্ময়কর গল্প বা রূপকথা; 'মহাকথা' অর্থাৎ মহৎগল্প আর 'বৃহৎকথা' অর্থাৎ সে গল্পের সঙ্গে আরো অনেক গল্প জড়িত, ব্যবহৃত হয়েছে।

'কথা' শব্দটি কাহিনি প্রকাশক শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে—'পঞ্চতন্ত্রে'। আবার বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে 'ধর্মকথা' শব্দটির ব্যবহার হলেও জাতকের কাহিনিগুলিকে 'কথা' নামেই আমরা জানি। 'ধর্মকথা'— জাতকের কাহিনি, বৌদ্ধধর্মের ধর্ম ও নীতিকথার প্রচার মাধ্যম। জৈন ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক মহাবীর জৈনধর্মের মর্মকথা প্রচার করেছেন—চূর্ণ, চূর্ণি, চূর্ণক, অবচূর্ণ এবং অবচূর্ণি—নামক জৈন কাহিনির মাধ্যমে। আসলে এই শব্দগুলির অর্থ একই, মর্ম বা সার। 'ব্রাহ্মণ'—গ্রন্থাদিতে আখ্যান, পুরাণ, ইতিহাস, অর্থবাদ—শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে 'গল্প'

অর্থেই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা মূলক গল্পে 'অর্থবাদ' শব্দটি প্রযুক্ত। 'পাণিনির ব্যাকরণ'-এ আখ্যান, আখ্যায়িকা, পুরাণ ও ইতিহাস শব্দগুলি মূলত 'কথা' অর্থেই প্রচলিত।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে কথাসাহিত্য তেমন একটা গুরুত্ব পায়নি, সেখানে কাব্যই মুখ্য আলোচ্য বিষয়রূপে বিবেচিত হয়েছে। 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা' শব্দদ্বয়ের প্রতি আলঙ্কারিকগণ কেবলমাত্র আলোকপাত করেছেন। দণ্ডীর মতে, 'আখ্যায়িকা' হচ্ছে আত্মজীবনীমূলক কাহিনি, আর 'কথা' হচ্ছে যে-কোন কাহিনি। আলঙ্কারিক বিশ্বনাথের মতে, 'কথা' হচ্ছে গদ্যভাষায় রচিত কাহিনি। আচার্য ভামহ মনে করেছেন, 'কথা' সংস্কৃত বা অপভ্রংশ ভাষায় রচিত কল্পিত-কাহিনি; যার বক্তা নায়ক নয়, অন্য কেউ হবেন, সেখানে কোন শ্লোক থাকবে না, উচ্ছ্বাস বিভাগও থাকবে না।

'অগ্নিপুরাণে' পাঁচ প্রকার গদ্য কাব্যের কথা বলা হয়েছে—আখ্যায়িকা, কথা, খণ্ডকাব্য, পরিকথা এবং কথানিকা। ভাষাবিদগণের মতে প্রাচীন 'কথানিকা' শব্দ থেকেই 'কহানি' বা 'কাহিনি'র উদ্ভব (কথানিকা > কহানি > কাহিনি)। বলাবাহুল্য কথানিকা এক ধরনের লোককথাই। প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন 'ঋগ্বেদ'এ 'কথা'র কোন উল্লেখ না থাকলেও স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে, সমকালে গল্পবলা ও শোনার প্রবণতা ছিল; ঋগ্বেদে তার আভাস ইঙ্গিতও রয়েছে। 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'—বলাবাহুল্য, সেখানে কথার পর কথা।

যে লোকসাহিত্যের মধ্যে কাহিনি আছে, যা মুখ্যত বর্ণনাত্মক যার মধ্যে লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনা পাশাপাশি বর্তমান; আকাশ, মাটি, চন্দ্র-সূর্য, স্বর্গ-নরক, জল-স্থল, আকাশ-পাতাল এক অতিসহজ নৈকট্যে আবদ্ধ, দূর-সুদূরের ব্যবধান যেখানে সহজেই অতিক্রমনীয়, যে কাহিনিতে মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ নিবিড় সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ, ভাষার বোধগম্যতা যেখানে কোন সমস্যা নয়, অলৌকিক শক্তির প্রভাব, দেব-দৈত্য-দানবের কার্যকলাপ, খল চরিত্রের প্রয়াস, কাহিনির কেন্দ্রিয় চরিত্রের উত্থান-পতন, নায়ক চরিত্রের সাহায্যকারী শক্তির ভূমিকা ইত্যাদি উপস্থিত থাকে, সাধারণভাবে কথার মালায় গাথা এ ধরনের কাহিনিকেই লোককথা বলে।

216611
11 JUN 2009
NBU DARJEELING • LIBRARY •

লোককথার বৈশিষ্ট্য ঃ

১। লোককথার কাহিনির আরম্ভ এবং সমাপ্তি—দুইই খুব ধীর লয়ে হয়।

২। লোককথার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কেন্দ্রিয় ঘটনা কাহিনির শুরুতে বর্ণিত হয় না।

৩। কাহিনির সর্বস্তরেই শুধুমাত্র বিপরীত প্রবণতার দু'টি চরিত্র সক্রিয় থাকে। অন্যান্য চরিত্র বর্তমান থাকলেও মূলত নিষ্ক্রিয় থাকে।

৪। সাধারণত সবচেয়ে দুর্বল ও ছোট চরিত্রই কাহিনির সমাপ্তিতে সাফল্য অর্জন করে।

৫। লোককথার কাহিনির মধ্যে একাধিক উপ-কাহিনি থাকলেও কখনোই মিশে গিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করে না।

৬। বহুঘটনার পুনরাবৃত্তি গল্পের 'সাসপেন্স' সৃষ্টি করে।

৭। কাহিনিতে বর্ণিত চরিত্রগুলির দোষ-গুণ—কাহিনির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এমন দোষগুণই বর্ণিত হয়, অন্য কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চরিত্রের মধ্যে থাকলেও তা প্রকাশ পায় না।

৮। লোককথার বর্ণনায় আঞ্চলিক বা জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রকাশ পায়।

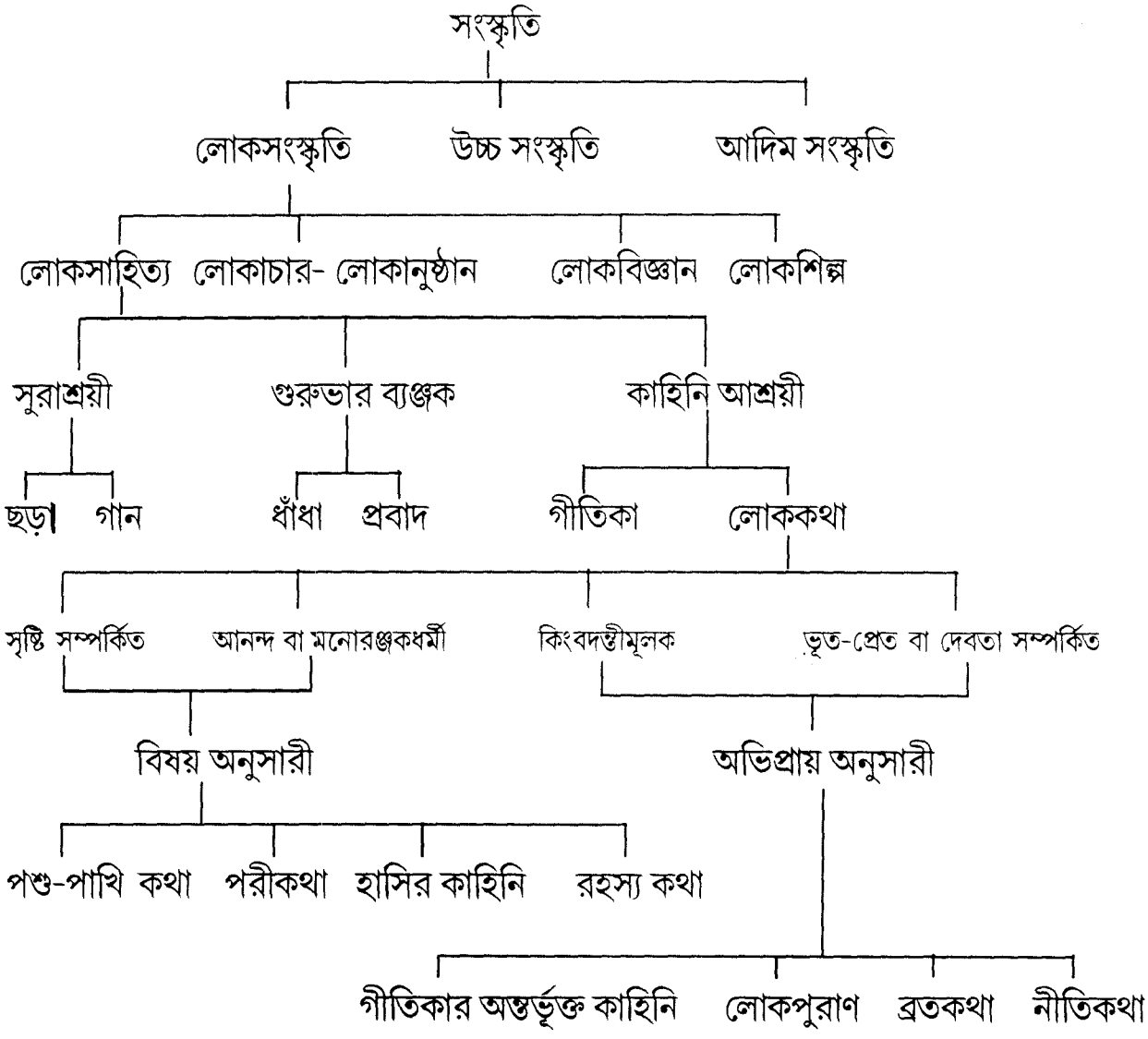
সংস্কৃতি
লোকসংস্কৃতি
উচ্চ সংস্কৃতি
আদিম সংস্কৃতি
লোকসাহিত্য
লোকাচার- লোকানুষ্ঠান
লোকবিজ্ঞান
লোকশিল্প
সুরাশ্রয়ী
গুরুভার ব্যঞ্জক
কাহিনি আশ্রয়ী
ছড়া
গান
ধাঁধা
প্রবাদ
গীতিকা
লোককথা
সৃষ্টি সম্পর্কিত
আনন্দ বা মনোরঞ্জকধর্মী
কিংবদন্তীমূলক
ভূত-প্রেত বা দেবতা সম্পর্কিত
বিষয় অনুসারী
অভিপ্রায় অনুসারী
পশু-পাখি কথা
পরীকথা
হাসির কাহিনি
রহস্য কথা
গীতিকার অন্তর্ভূক্ত কাহিনি
লোকপুরাণ
ব্রতকথা
নীতিকথা

লোককথার শ্রেণিবিভাগ

সুপ্রাচীন সমাজে নানা লোকবিশ্বাস. বিভিন্ন সৃষ্টিমূলক কাহিনি, কল্পনাশ্রয়ী কাহিনি, ভূত-প্রেত-দস্যি-দানব-পরী ইত্যাদির কাহিনি, সমাজ বিবর্তনের ধারা প্রবাহের সামাজিক কাহিনি — লোককথার ইতিহাস খুবই পুরোনো; সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে কাহিনি ভিত্তিক কাহিনিগুলির প্রায় সবগুলিই লোককথার আকারে বর্ণিত হয়ে আসছে। মোটকথা, লোককথা প্রাচীন ও অক্ষরজ্ঞানহীন মানব-মন সৃজিত মৌখিক ঐতিহ্যের ফসল, যাতে রয়েছে—অলীকতায় আকীর্ণ উপাখ্যান, রোমাঞ্চকর অভিযানের, অভিজ্ঞানের বিবরণ, যেখানে জীবজন্তু, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত—মানুষের মত আচরণ করে, যেখানে আছে নিজস্ব নয় এমন অস্বাভাবিক, অদ্ভুত বিষয়, আছে ভৌতিক গল্প, দৈত্য, পরী ও সাধুসন্তের গল্প, অনিষ্টকর আত্মার গল্প, ছোটো ছোটো কৌতুকময় কাহিনি—যা কি-না কখনো কোনো আঞ্চলিক চরিত্রকে নিয়ে গড়ে ওঠে। বলাবাহুল্য, লোককথার ক্ষেত্রটি বিশাল, বিচিত্র, বিস্তৃত। লোককথার প্রবহমান ধারায় বহু বৈচিত্র্যের সমন্বয়ের জন্য শ্রেণি বিভাজন ক্ষেত্রটি খুবই জটিলতর। মৌখিক ঐতিহ্যবাহি বলে একটি লোককথার কাহিনি অনেক সময় অন্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। তখন সঠিক বিভাগে তাকে অন্তর্ভূক্ত করা বেশ জটিল হয়। মূল কাহিনিটি কোন ভাগের অন্তর্ভুক্ত তা খুঁজে বের করাও বেশ কঠিন হয়। তবে লোককথা কোন বিচ্ছিন্ন কথা সমষ্টি নয়, এর নিরবচ্ছিন্ন স্রোতের মধ্যে তার অভিযাত্রা। বিভাজন সৃষ্টি করে লোককথার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আনা না গেলেও লোককথার শ্রেণি বিভাগ করতেই হয়, তাছাড়া আলোচনার সুবিধার জন্যও কিছু বিভাজন আবশ্যক হয়ে পড়ে।

বঙ্গের প্রচলিত লোককথাগুলিকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ফেলা চলে —

১। সৃষ্টি সম্পর্কিত লোককথা

২। আনন্দ বা মনোরঞ্জকধর্মী লোককথা

৩। কিংবদন্তি মূলক লোককথা

৪। ভূত-প্রেত, দানব-দৈত্য, দেবতা সম্পর্কিত লোককথা।

সৃষ্টিসম্পর্কিত ও আনন্দ বা মনোরঞ্জকধর্মী লোককথার কাহিনি মূলত বিষয়ানুসারী, এই বিষয়ানুযায়ী দু'শ্রেণির লোককথাকে আমরা চারটি উপ-শ্রেণিতে বিভাজন করতে পারি—পশুপাখি

কথা, পরী কথা, হাসির কাহিনি এবং রহস্য কথা।

আবার কিংবদন্তি ও ভূত-প্রেত, দানব-দৈত্য-দেবতা সম্পর্কিত লোককথার কাহিনির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় অভিপ্রায়। এই দুইশ্রেণির লোককথাকেও চারটি উপ-শ্রেণিতে বিভাজন করা যায়—গীতিকার অন্তর্ভূক্ত কাহিনি, লোকপুরাণ, ব্রতকথা ও নীতিকথা।

লোককথার মূল চারটি শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

১. সৃষ্টি সম্পর্কিত লোককথা

মানুষের আদিমতম বিশ্বাস, চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণ, ভয়-ভীতি, বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধারের ব্যাকুলতা, ধর্মীয় চেতনা, জৈবিক আবেদন , মানসিক উত্তেজনা ও উদ্বেলতা, হৃদয়বৃত্তির বিভিন্ন দিক যে-সব লোককথায় প্রতিফলিত, মোটামুটি ভাবে বলা যায় সেগুলোই সৃষ্টিমূলক লোককথা। সৃষ্টি সম্পর্কিত লোককথাকে বলা চলে 'বিজ্ঞান পূর্ব-যুগের বিজ্ঞানীসুলভ মানসিকতার কথা'। সেই স্মরণাতীত কাল থেকেই কোন না কোন দৈবশক্তির উপর বিশ্বাস থেকেই এই শ্রেণির লোককথাগুলি সৃষ্টি। তবে প্রাচীনতাই এই শ্রেণির লোককথার বিচারের ক্ষেত্রে মাপকাঠি হলেও একমাত্র মাপকাঠি নয়; কারণ এই শ্রেণির লোককথার গঠন যুগে যুগে ও দেশে দেশে একই রকম নয়, তাছাড়া বিশ্বের সমস্ত দেশের ও সমস্ত সংস্কৃতির চিন্তাভাবনা একই ধরনেরও নয়, তাই সৃষ্টি সম্পর্কিত লোককথার আকৃতি ও প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়।

আদিম সংস্কারই গড়ে তুলেছে পৃথিবীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বলয়ের সংখ্যাতীত মিথ, এবং এই সব আদিম সংস্কৃতির পরিশীলিত রূপই সাজিয়ে তুলেছে ধ্রুপদী সংস্কৃতির বৃত্ত। আদিকালের মানুষ বিশ্বরহস্যের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে যে উত্তর পেতে চেষ্টা করেছিল সৃষ্টি সম্পর্কিত লোককথায় তারই প্রতিফলন পড়েছে। তাই সৃষ্টি সম্পর্কিত লোককথাগুলি বিশ্লেষণ করলে আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মবিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক চেতনা, শিল্পবোধ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণার পাওয়া যেতে পারে। এই ধারার লোককথার কাহিনিতে একটি অন্তর্নিহিত গভীর বিষয় প্রতিফলিত হয়, শুধু কল্পনার প্রভাবজাত নয়, তার মধ্যে ধ্রুবসত্যেরও ইঙ্গিত থাকে। সভ্যতার গতিপথ নির্ণয়ে এ ধারণা একান্তভাবে কাম্য।

২. আনন্দ বা মনোরঞ্জনধর্মী লোককথা

এই ধরনের লোককথার মূল উদ্দেশ্য হাস্য উৎপাদন করা বা কৌতুক রস সৃষ্টি করা। একটি মাত্র ঘটনা এই ধরনের লোককথার মূল আখ্যান রচনা করে। তাই এই কাহিনিগুলি আকৃতিতে সাধারণত ছোটো হয় এবং প্রকৃতিতেও সরল হয়। একটি মাত্র ঘটনা, একাধিক চরিত্র থাকলেও কাহিনিতে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত খুবই সীমিত হয়। জোলা, জামাই, বোকা—এই শ্রেণির চরিত্র লোককথায় বিশেষ স্থান লাভ করেছে।

৩. কিংবদন্তি লোককথা

সৃষ্টিমূলক লোককথার পরবর্তীকালে কিংবদন্তির উৎস। সৃষ্টি লোককথার কল্পকথার অতিলৌকিক স্তরের পরে যখন বাস্তব কিছু ইতিহাসবোধ লোকসমাজের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করে, মানব সমাজের সেই স্তরেই কিংবদন্তির জন্ম হয় বলেই মনে হয়।

কিংবদন্তির সঙ্গে ইতিহাসের একটা ক্ষীণ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। পুরুষ পরম্পরায় ধারাবাহিকতার জন্য পরবর্তীকালে যদিও কিংবদন্তিতে ইতিহাসের সূত্র সন্ধান খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। প্রাথমিক অবস্থায় কিংবদন্তির মধ্যে সত্য রূপ থাকলেও, পরবর্তী স্তরে ধাপে ধাপে ইতিহাস প্রায় মুছে যায়, রয়ে যায় সম্ভব-অসম্ভবের এক কাহিনি। তাই বলা যায়, ইতিহাসের উৎস হিসেবে কাজ করেও কিংবদন্তি ঠিক ইতিহাস নয়। কিংবদন্তির কাহিনি সত্যাশ্রয় করেই গড়ে ওঠে, তবে সেই সত্য ঘটনার সঙ্গে জনশ্রুতি, লোককল্পনা ইত্যাদি যুক্ত হয়। আবার অনেক সময় সেই সত্য ঘটনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে কেবল জনশ্রুতিই কিংবদন্তিতে বেঁচে থাকে।

যে লোককথায় অতীতকালের কোন বীর পুরুষ, কোন জনপ্রিয় রাজা, কোন সমাজসেবী নেতা, জননেতা, কোন বিখ্যাত, অখ্যাত অত্যাচারী সম্রাট বা ক্ষমতাময় ব্যক্তি অথবা এই ধরণের চরিত্রের একটি বা একাধিক কাহিনি বর্ণিত হয়, সাধারণত সেইসব লোককথাকে আমরা কিংবদন্তি লোককথা বলতে পারি। কিংবদন্তির চরিত্রগুলির বিশেষ পরিচয় থাকে অর্থাৎ চরিত্রগুলি নির্বিশেষ

নয়; আর কিংবদন্তিতে লোকসমাজের মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করার মত। লোকসমাজের আগ্রহ ও কল্পনা সুপ্ত থাকে কিংবদন্তি লোককথার মধ্যে।

৪. ভূত-প্রেত-দেবতা/ভৌতিক লোককথা

যে লোককথায় ভৌতিক চরিত্র থাকে, ভূত, প্রেতাত্মা বা বিদেহী ভীতিপ্রদ চরিত্র যে লোককথার কাহিনি নিয়ন্ত্রণ করে, এক কথায় সেই সব লোককথাকে ভৌতিক লোককথা বলে।

এই ধরনের লোককথাগুলো আকারে বেশি বড় হয় না, কাহিনির জটিলতা অপেক্ষাকৃত কম, প্রকৃতিগত দিক থেকে এই শ্রেণির লোককথা অনাড়ম্বর হয়। 'ভয়ঙ্কর রস'ই এ ধরনের লোককথার প্রধান অবলম্বন ও আকর্ষণ।